অধ্যায় ৪

সংস্কৃতির ক্ষমতায়ন

ক্ষমতা ও সংস্কৃতি পরস্পরচ্ছেদিত। এই সংযুক্তির তাৎপর্য স্পষ্ট হবে যদি আমরা প্রশ্ন করি : কাদের সংস্কৃতি ? ঠিক এই প্রশ্নটিই অধস্তন জনসাধারণ করেছিল, আর দলিত সম্প্রদায়ের জন্য এ প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীগুলোর স্বার্থের পূজা করে, সেই তার একটি সমজাতীয় ব্যবস্থা মেনে নিতে দলিত এবং অন্যান্য পরাভূত জনগোষ্ঠী অস্বীকার করে। অপরদিকে, শাসক দলিত জনগণের সংস্কৃতিকে দুর্বল করে দেওয়া ও অস্বীকার করার মাধ্যমে, বর্ণ ও শ্রেণীগুলো তাদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা আধিপত্যকে জোরালো করতে চায়। এখানে উঠে আসে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : জ্ঞান। সামাজিক জীবনে, জ্ঞান কখনো ক্ষমতা ও সংস্কৃতি থেকে স্বাধীন নয়। বিষয়টা আমরা বুঝতে পারব যদি আমরা এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করি যে, ইতিহাস জুড়ে কর্তৃত্বকামী শ্রেণীগুলোর নিকট শাসিত জনগোষ্ঠীকে বশ করে রাখার লক্ষ্যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর উপায়টি ছিল তাদেরকে জ্ঞান-বিবর্জিত রাখা। ভারতে, জ্ঞানের ব্রহ্মণ্যকরণ এবং একই সময়ে দলিতদের শিক্ষার অধিকারকে অস্বীকৃতি তাদেরকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সংস্কৃতি, ক্ষমতা, বর্ণ ও জ্ঞানের এই জটিল জালে প্রবেশ করার আগে, আমরা আমাদের মনোযাগ চালিত করব সংস্কৃতির বাস্তবতা ও ধারণাকে ঘিরে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে।

সংস্কৃতি একটি এত জটিল ধারণা যে, একে একটি মাত্র সার্বজনীন শ্রেণীভুক্তকরণের আওতায় খাপ খাওয়ানো কঠিন। তবে, আমরা সংস্কৃতির কিছু দিকের উপর আলোকপাত করতে পারি, যাতে যখন আমরা এটাকে দলিতদের ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করি তখন যেন আমরা ধারণাটি বুঝতে পারি। সংস্কৃতির (culture) একটি প্রাথমিক অর্থ ব্যুৎপত্তিগত শব্দ ডলর্ফলরট এর সঙ্গে যুক্ত – যার অর্থ চাষ। চাষের জমির মতই, ফল ফলানোর লক্ষ্যে মানব মনেরও চাষের প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যক্রম হচ্ছে, মনকে চাষের অন্যতম উপায়, এবং আরও বিস্তৃত অর্থে, এটা হচ্ছে কোন ব্যক্তির স্বভাব, মূল্যবোধ, মনোভাব, ইত্যাদির গঠনদান। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি কোন জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, তাদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ঐতিহ্য, শিল্পকলা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এ বিষয়গুলোর সবই আভ্যন্তরীণ গতিশীলতার মাধ্যমে এবং বাহ্য উদ্দীপকের মাধ্যমে বিকশিত হতে থাকে। তৃতীয় অর্থে, সংস্কৃতি জটিল মানব সম্পর্কের গ্রন্থিবন্ধনকেই নির্দেশ করে, যে সম্পর্ক একটি সমাজের মধ্যেই গড়ে ওঠে, যেমন আত্মীয়তা সম্পর্ক এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পর্ক। পরিশেষে, সংস্কৃতি আরও নির্দেশ করে প্রতীকী ব্যবস্থাকে, যা মানুষ একে-অপরের সঙ্গে আদান-প্রদান একটি মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলে। যখন কোন সমাজ এর সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে তুলে ধরে, তখন এটা আরও হয়ে ওঠে বিশেষ সমাজটির জন্য অর্থ ও তাৎপর্যের বাহন। এই অর্থে সংস্কৃতি তাদের জাগতিক-দৃষ্টিভঙ্গি, মূল ধারা, কর্তৃত্বকামী মূল্যবোধকে আপন করে নেয় যেগুলো অনেক সময়

প্রতিদিনকার জীবনের নানা পুরাণ, গল্প ও রূপকে মোড়া।

জীবনের বিস্তৃত পরিসরের কারণে, কেন সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচয়, তার মর্যাদা, আত্মসম্মান ও তার ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই বুঝা যায়। এই অধ্যায়ে দলিত সংস্কৃতির কিছু ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে আর জানব কিভাবে এগুলো তাদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে উপকারে আসতে পারে। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছি একটি স্থির সত্তার মত, কোন স্থিতিশীল অর্থে নয়। আমরা যেমনটি লক্ষ্য করেছি, সংস্কৃতি বিকশিত হওয়া অব্যাহত রেখেছে, আর এটা দলিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। প্রকৃতপক্ষে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অনেক দলিত সংগ্রাম তেমনসব মতাদর্শের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যেগুলো সংস্কৃতিকে অপরিহার্য করে তোলে।

সংস্কৃতি – ক্ষমতায়নের উৎস

একটি জাতির ক্ষমতা নির্ভর করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে, যা তারা প্রকাশ করে শুধুমাত্র তার উপর নয়, সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, যেন সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও তাদেরকে ক্ষমতাপন্ন করে তোলা হয়। দলিতদের ক্ষেত্রেও এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। তাদের নিকট, সংস্কৃতি ক্ষমতায়নের শুধু লক্ষ্যই নয়, পাশাপাশি এটা আরও হচ্ছে ক্ষমতায়নের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই কারণে দলিত জাগরণের শুরু থেকেই, তারা এই মাধ্যমটির ব্যবহার ঘটিয়েছে আর আশা পোষণ করেছে তাদের সংস্কৃতিকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছানোর। যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা তাদেরকে সুকৌশলে এড়িয়ে চলেছে, তখন কিন্তু তারা তাদের সাংস্কৃতিক অস্ত্রকে শক্ত করে ধরে রেখেছে।

দলিতদের সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের শুরু উচ্চ বর্ণগুলো যেগুলো দাবি করে যে, তারাই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির স্রষ্টা সেই তাদের প্রণীত সংস্কৃতির ধারণার নিপাতন দিয়েই। দলিতরা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিকৃত ধারণার উপস্থাপনকে চ্যালেঞ্জ করে, কেননা এ সংস্কৃতি তাদেরকে পরিধির বাইরে ফেলে রাখে। পরিবর্তে, দলিতরা অধিকারের সাথে দাবি করতে পারে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির গঠনে তাদের অবদান কোন অংশেই কম নয়। অম্বেদকরের কথাগুলো এই সত্যই ব্যাখ্যা করে :

হিন্দুরা চেয়েছিল বেদ আর তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল Vyasa-কে যিনি বর্ণ হিন্দু ছিলেন না।

হিন্দুরা চেয়েছিল একটি মহাকাব্য আর তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল বাল্মিকীকে, যিনি অস্পৃশ্য ছিলেন।

হিন্দুরা চেয়েছিল একটি সংবিধান, আর তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল আমাকে।

সংস্কৃতির প্রতি দলিত দৃষ্টিভঙ্গি নিপাতন ঘটায় কিছু আধুনিক তত্ত্বের যেগুলো ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে "মহান ঐতিহ্য" ও "নগণ্য ঐতিহ্যের" মধ্যে একটি তুলনার প্রেক্ষাপটে পাঠ করতে চায়। এটা এ বিষয়টার উপর জোর দেয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র তাদের সৃষ্ট নয় যারা নিজেদের বিশুদ্ধ ও দু'বার জাত বর্ণ ভাবে। সংস্কৃতিক (Sanskritic) কৃষ্টির সঙ্গে এর কোন সাযুজ্য নেই। ঘটনা হল দলিত জনগণের সৃজনী শক্তিকে উচ্চ বর্ণগুলো সুপরিকল্পিতভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে সরিয়ে রেখেছে, কালিমালেপন করেছে ও বিকৃতি ঘটিয়েছে। কাজেই, "নগণ্য ঐতিহ্য" হিসেবে দলিতদের সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারের চিন্তাভাবনা করাটা ভুল হবে। এমন কাজ হবে একটি সদয় স্বীকৃতি যা সত্যের মুখে পালিয়ে বেড়ায়। প্রকৃত ঘটনা হল, দলিতরা একটি উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন সংস্কৃতির অধিকারী, আর এ সংস্কৃতি জগত, সমাজ, প্রকৃতি, এবং আরও অনেক কিছুর একটি বিস্তৃত দর্শনে ঠাসা। এটা আমরা বুঝতে পারব যদি আমরা একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে উপর থেকে নয় কিন্তু একেবারে নীচ থেকে দেখি ও ব্যাখ্যা করি।

শিক্ষার প্রাধান্য

আমরা যদি একটিমাত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা দলিতদের ক্ষমতাহীনতা বুঝায়, তার নাম করতে পারি, তাহলে এটা হচ্ছে, শিক্ষার অনুপস্থিতি। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, বাবাসাহেব অম্বেদকর অনেক আগেই দলিতদের "শিক্ষিত হওয়ার জন্য, সংগঠিত হওয়ার, এবং আন্দোলন করার জন্য" পুনঃ পুনঃ আহ্বান

জানিয়ে শিক্ষার ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর সারা জীবনভর আম্বেদকর দলিতদের জন্য শিক্ষার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেছেন। তাই যখন আমরা সংস্কৃতির কথা বলি, তখন সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে শিক্ষার সামগ্রিক ক্ষেত্রকে নির্দেশ করি।

সর্বপ্রথমত, আশু প্রয়োজন দলিতদের শিক্ষাকে এর সব ধরনের মাধ্যমে সক্ষম করে তোলা, যেমন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, ঘরোয়া শিক্ষা এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পাদিত হয় শিক্ষার সনাতনী ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মাধ্যমে – স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির মাধ্যমে। বর্তমানে দলিতদের শিক্ষার হার জাতীয় শিক্ষা হার ৫২.২১ ভাগের বিপরীতে মাত্র ৩৭.৪১ ভাগ। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা যায়, আসন-সংরক্ষণ নীতিমালা সত্ত্বেও, দলিতদের হার এখনো অনেক নীচে।

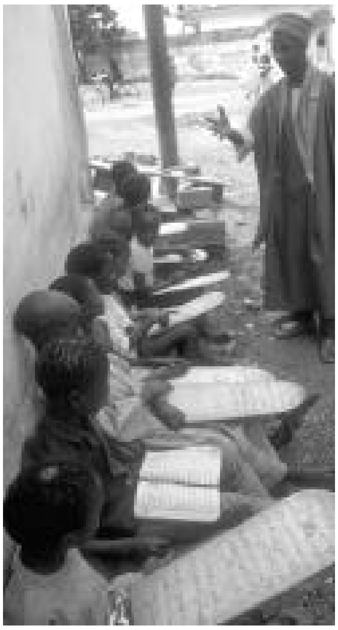

অর্থনৈতিক মাধ্যম এবং শিক্ষায় অগ্রগতি এ দু'টি বিষয় পরস্পর গভীরভাবে সংযুক্ত। সুতরাং, দলিত শিক্ষা নিশ্চিত করতে, মৌলিক শর্তটি হচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। অর্থনৈতিক মাধ্যমের অভাব এবং পরিবারের টিকে থাকার জন্য শিশু শ্রমের উপর নির্ভরতা দলিত ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলোতে, এবং অগণিত ঝরে-পড়া ছেলেমেয়েদের নিম্ন উপস্থিতির কারণ। যে কারণে, তারা তাদের উন্নয়নের জন্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হতে পারে না। দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে দলিতদের ছেলেমেয়েদের নাম তালিকাভুক্তকরণে বৃদ্ধি পেলেও, প্রতি একশ' দলিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র ৪ জন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছায়। গ্রামাঞ্চলের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ দলিত নারী এবং শতকরা ১.২ ভাগ দলিত পুরুষ স্নাতক পাশ।

ভারতের মত একটি অত্যন্ত অসম সমাজ ব্যবস্থায়, দলিতদের কল্যাণ ও তাদের বৃদ্ধির জন্য পল্লী অঞ্চল ছেড়ে শহরে পাড়ি জমানো এবং বহুমুখি পেশা এবং পেশার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমেই এটা সম্ভব করে তোলা যায়। আধুনিকতার সুফলগুলো আহরণে দলিতদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সুবাদে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে, তা নয়। এর রয়েছে একটি গভীর সামাজিক নিহিতার্থ। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে আর তা হচ্ছে দলিতদের নিকট, তাদের কলঙ্কিত ও বৈষম্যমূলক সনাতনী পেশাগুলো থেকে শুধুমাত্র শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে বেরিয়ে আসা সম্ভব। এইভাবে, শিক্ষা হয়ে ওঠে দলিতদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, আর এটা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে এগিয়ে নেয়।

স্বাস্থ্যের মতই, শিক্ষা রাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব-কর্তব্য, আর দলিতরা আইনগতভাবে দাবি করতে পারে যে, রাষ্ট্র তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতির জন্য ভাল ভাল কাঠামো ও মাধ্যমের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ভারত হচ্ছে কিছুর রাষ্ট্রের মধ্যে একটি, যা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে শিক্ষা খাতে এর জাতীয় রাজস্বের খুব কমই ব্যয় করে। যদি ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাখাতে কেন্দ্রে ও রাজ্যে শতকরা ৩.৬৭ ভাগ ব্যয় হয়ে থাকে, তাহলে বেড়ে যাওয়ার পরিবর্তে এই ব্যয়কে পরবর্তী বছরগুলোতে এমনকি ক্রমশঃ কমে আসার পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র শতকরা ৪.০২ ভাগের বেশী ছিল। এই নিম্ন ব্যয় বিশেষ করে তফসিলি জাতিদের শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলে, কেননা তফসিলি উপজাতিদের পাশাপাশি তফসিলি জাতিরাও রাজ্যের মধ্যস্থতার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

সরকারি স্কুলগুলোতে সুখ্যাতির অভাবের পরিবেশ, শিক্ষক সংকট এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসমূহ এগুলো

হচ্ছে তফসিলি জাতিভুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর ঝরে পড়ার কারণ। এর সঙ্গে আরও রয়েছে দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের অ-দলিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা করা পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্য। আর পাঠ্য বইয়ের বিষয়সূচী সম্পর্কে বললে বলা যায়, এগুলো উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীগুলোর ভাবনা, মূল্যবোধ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভরা, এগুলোতে তফসিলি জাতিগণের বাস্তব জীবন পরিস্থিতির উল্লেখ কমই আছে।

উচ্চতর শিক্ষা

উচ্চতর শিক্ষা স্তরে, দলিতদের ক্ষমতায়ন কারিগরী প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক কোর্সের উদ্দেশে বেশী বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাবি করে। সর্বোপরি, শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে কর্মসংস্থান সুযোগের সঙ্গে। যখন উচ্চতর শিক্ষা দলিত যুবকদের গ্রাম পর্যায়ে ও সমসঙ্গীদের মধ্যে মর্যাদাবোধ যোগায়, যখন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে খাপ খায় না, তখন তাদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ কাজ করে। সুযোগ-সুবিধার প্রসঙ্গে এসে একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়, যা বিশিষ্ট রাষ্ট্রপরিচালক নেলসন ম্যাণ্ডেলা তার জীবনী-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার শ্রেণী-সহপাঠী একজন অতিশয় প্রতিভাবান ও মেধাবী ছাত্রী ম্যাথোনা সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু তাকে নিয়ে পরবর্তীতে আর কিছুই শোনা যায়নি। আমরা অনুমান করতে পারি যে, শেষ পর্যন্ত সে হয়ত একজন সাধারণ নারী শ্রমিক হিসেবে কঠোর কায়িক শ্রমে নিয়োজিত আছে, কেননা মাণ্ডেলা বলেছেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাকে স্কুলে পাঠানোর সামর্থ তার বাবা-মা'র নেই। ম্যাণ্ডেলা তার কাহিনী শেষ করেছেন এই বিশেষ কথা দিয়ে, "সামর্থের অভাবই যে আমার জনগণকে সীমাবদ্ধ রেখেছে তা নয়, কিন্তু সুযোগের অভাবই।" উচ্চতর শিক্ষার জন্য সুযোগ-সুবিধার অভাবই এ দেশের লক্ষ লক্ষ দলিত ছেলেমেয়েদের তাদের অনন্য প্রতিভা ও মেধার বাস্তব রূপায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দলিত অভিজ্ঞতা ও ভাবনাসমূহের উপর আলোকপাতকারী শিক্ষা

দলিত ক্ষমতায়ন একটি আলাদা শিক্ষা রীতি এবং পাঠ্যসূচীর উন্নয়ন দাবি করে। দলিতদের জগত, তাদের চলমান সংগ্রাম, ইতিহাসের তাদের ব্যাখ্যা, ইত্যাদি, এগুলো শিক্ষার বিভিন্ন খাতে শিক্ষাদানে স্থান করে নিতে পারেনি। এছাড়া, বেড়ে চলা ও অসংখ্য দলিত সাহিত্যকর্ম থেকে উদ্ধৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে তুলে ধরারও প্রয়োজন রয়েছে। একইভাবে, সমাজ বিজ্ঞানগুলোতে, দলিতরা ও দলিত গবেষণাগুলো শুধুমাত্র সামান্য মনোযোগ লাভ করতে পেয়েছে। সমগ্র জাতির জন্য দলিতরা ও দলিত গবেষণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কেননা দলিত বিষয় নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ ও গবেষণা পরিশেষে সমগ্র সমাজেরই উপর আলোক ঝরাবে এবং বাস্তবতাকে অ-গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে।

আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, জ্ঞানের ভূমিকা শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করা নয় কিন্তু রূপান্তর ঘটানোও, তাহলে আমাদের স্বীকার করা প্রয়োজন যে, যে উপায় অবলম্বনে মানবজাতিকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ভারতে সমাজ বিজ্ঞানগুলো অনুশীলিত হয়েছে, তা জাত বা বর্ণের অবস্থার পরিবর্তনে অথবা যারা অস্পৃশ্য হিসেবে বর্ণ প্রথার বাইরে পরিত্যক্ত, তাদের ক্ষমতায়নে খুব কমই অবদান রেখেছে। Shirmila Rege শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিতদের জন্য "নগণ্য স্থান" নয় কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবি করেছেন। এটা হচ্ছে দলিতদের ভাবনাগুলোকে পুরোভাগে স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

যখন আমরা স্বীকার করি, দলিত ক্ষমতায়নের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে দলিতরা নিজেরাই, তখন শিক্ষিত সমাজের উচিত তাদের সংগ্রামকে সমর্থন যোগানো আর

এ কাজটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পথ অনুসরণের মাধ্যমে করা, যে পথ দলিতদের হেতুকে সহায়তা করবে। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক নির্দেশনা ব্রক্ষণ্য দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ ঘটনার কারণে অ-ব্রক্ষণ্য ভাবনাগুলোকে প্রান্তিকীকরণ কর হয়েছে। আর ব্রক্ষণ্য হচ্ছে একটি ইংরেজপ্রেমী শিক্ষা, জন্ম দিচ্ছে অভিজাত শ্রেণীর যারা প্রান্তিকদের হেতুর প্রতি সংবেদনহীন। বর্ণ পরিণত হয়েছে একটি নিষেধাজ্ঞায় আর এটা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করা হয় না, যখন বাস্তব জীবনে, এই বর্ণই হচ্ছে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী শক্তি, যা জাতির জীবনের প্রতিটি দিক নির্ধারণ করে। দলিতদের ক্ষমতায়ন ঘটবে ও তারা ক্ষমতা অর্জন করবে যদি বর্ণ ও অস্পৃশ্যতা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করা এবং এগুলো নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে হলে, আমাদেরকে অবশ্যই দলিত বয়স্কদের মাঝে ব্যাপকভিত্তিক নিরক্ষরতার বাস্তবতাটি বিবেচনায় আনতে হবে। যারা বয়স্ক তাদের স্কুলে যাওয়ার বয়স পার হয়ে গেলেও, তাদেরও প্রয়োজন আছে পড়তে ও লিখতে। তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা শুধুমাত্র তাদের লিখতে-পড়তেই নয়, তাদের চারপাশের জগত ও সমাজকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতেও সাহায্য করে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই শিক্ষা কার্যক্রম সফল হয়েছে। অনেক গবেষণা থেকে যেমনটি প্রকাশ পায়, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবই হচ্ছে অধিকাংশ সময় দলিতদের নিপীড়ন বা বলির শিকার হওয়ার কারণ। দৈনন্দিন জীবনে, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তাদের সাহায্য করে। শিক্ষিত দলিতরা স্বাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যে আন্দোলনের ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

একটি প্রতি-সংস্কৃতি

দলিত ক্ষমতায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক যেহেতু প্রতিরোধ, তাই সংস্কৃতির বলয়েও এটা অনুশীলিত হয়। বিবিধ দলিত আন্দোলনগুলো ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণগুলোর সাংস্কৃতিক ও ভাবধারাগত কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। একটি প্রতি-সংস্কৃতি হিসেবে, তাদের উপর আধিপত্য ফলানোর জন্য সংস্কৃতিকে যে উপায়ে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা নিয়ে দলিতরা প্রশ্ন তোলে। শুচি-অশুচি, উচ্চ ও নিম্ন, পবিত্র-অপবিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা মূলে আঘাত হানে। দলিত সাংস্কৃতিক সমালোচনামূলক নিবন্ধ এগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত পুরাণ, প্রতীকী ব্যবস্থা ও উপাসনার স্বরূপ উন্মোচন ও প্রকাশ করছে। প্রতিরোধ অনেক সময় বলিষ্ঠ প্রতীকী ও শৈল্পিক রূপ পরিগ্রহণ করে। ব্রক্ষণ্য ও উচ্চ বর্ণীয় সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহের দাবি-দাওয়া দলিত প্রতীকসমূহ, যেগুলো অপর জগত-দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ-ব্যবস্থা প্রকাশ করে, সেগুলোর প্রতি-অবস্থানে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সমসাময়িক দলিত কবি সুবিহা লিখেছেন :

তোমরা পূজা কর রামের
আমরা পূজা করি ঈশ্বররূপে মধুরাইভিরানের (দলিত দেবতা)
তোমরা গান্ধীকে জাতীয় নেতা বলে মান
কিন্তু আমরা অম্বেদকরকেই আমাদের জাতীয় নেতা বলে মানি
তোমরা গর্ব কর Thyagarayar-কে নিয়ে যিনি হচ্ছেন তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার
আমরা গর্ব করি Ilaiyaraja-কে নিয়ে যিনি হচ্ছেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার
তোমাদের সাংস্কৃতিক নাচ হচ্ছে ভারতনাট্যম
আমাদের সাংস্কৃতিক নাচ হচ্ছে Paraiyattam (parai-drum নাচ)।

প্রতি-সাংস্কৃতিক গতি সেই উপায় গ্রহণ করে যে উপায়ে উচ্চবর্ণগুলো ইতিহাস রচনা ও প্রণয়ন করেছে। উচ্চ বর্ণরাই হচ্ছে ইতিহাসের মুখ্যচরিত্র, ইতিহাসের অঙ্গনে দলিতদের কোন স্থান নেই। ইতিহাস থেকে তাদের বহিষ্কার বাস্তব জীবনে যে সামাজিক বহিষ্কার ও প্রান্তিকীকরণ অভিজ্ঞতা দলিতরা করছে তার প্রতিফলন ছাড়া কিছু নয়। কর্তৃত্বশীল ঐতিহাসিক বৃত্তান্তগুলো লিখিত হয়েছে দু'বার জাত বর্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে। অভিলিখনগুলো প্রধানত ব্রাহ্মণদের প্রতি রাজা ও

শাসকদের উদার মনোভাব সম্পর্কেই বলে; সাহিত্য কর্মগুলোতে খুব কমই ক্রীতদাসে পরিণত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আজকে, দলিতদের ইতিহাস পুনঃ রচনার নানা প্রচেষ্টা চলছে, ইতিহাস অগণিত মৌখিক ঐতিহ্য আর স্থানীয় উপাখ্যানের সঙ্গে অনেক সময় জড়িত। এটা একটা বিশাল কাজ, কেননা প্রাপ্তিসাধ্য তথ্যগুলো অপর্যাপ্ত আর এ সকল তথ্য আসে উচ্চ বর্ণগুলো, যেগুলো দলিতদের ব্যাপারে খুবই পক্ষপাতদুষ্ট, সেই তাদের নানা উৎস থেকে। কেননা, দলিতদের বদ্ধমূল দাসমনোভাব নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছে নানা পালন-পদ্ধতি, যেগুলো তাদের নিজস্ব সত্তা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে একটি সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে, যে সংস্কৃতি যারা তাদের উপর প্রভুত্ব চালায়, তাদেরই সৃষ্টি।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, দলিতদের রয়েছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি যাকে আড়াল করা ও দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এই সংস্কৃতি তাদের বহুমুখী উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। দলিতরা যেসব বিভিন্ন পেশার সাথে সেগুলোর একটা সার্ভে বা জরিপ করার পর, একজন বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী উল্লেখ করেছেন,

সমগ্র দেশজুড়ে নিম্ন বর্ণ ও সমাজচ্যুতদের উপর পরিচালিত এই সার্ভে থেকে অনেকগুলো কৌতুহলোদ্দীপক এবং সম্ভবত এখনো পর্যন্ত অজানা দিক ও বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে এসেছে । সর্বপ্রথমত এটা তুলে ধরে যে, ভারতের নিম্নবর্ণ ও হরিজন একটি জনগোষ্ঠীর বংশধর যারা একটি মোটামুটি উচ্চমাত্রায় উন্নত ও জটিল সংস্কৃতির অধিকারী। সন্দেহ নেই এ জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির চাষ করে আসছিল, কিন্তু আজকের নিম্নবর্ণ ও সমাজচ্যুতদের পূর্বপুরুষরা ছিল সামগ্রিকভাবে এই সংস্কৃতিতে দক্ষ কারিগর এবং হস্ত শ্রমিক। তারা কামার, কুমোর, তাঁতী, চর্মকার ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা সুদক্ষ ছিল শিল্পকর্মে, গান, বাদ্যযন্ত্র বাজানো ও নাচে, গান, কবিতা এবং লোককাহিনী ও বীরত্বগাথা রচনায়। তারা ছিল এই সংস্কৃতির চিত্রকর ও ভাস্কর।

এ সকল বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও সৃজনশীল কাজ পুঞ্জিভূত করেছে জ্ঞান ও দক্ষতা, যা বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। এ কাজগুলো থেকে প্রকাশিত প্রযুক্তি ও দক্ষতা হচ্ছে, তাদের সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। এই সংস্কৃতিই সেই সমাজের উপজীবিকায় ব্যাপক অবদান রাখছে, যে সমাজকে নিষ্ঠুরভাবে ঘৃণা ও অবহেলা করা হয়েছে। সুতরাং, দলিতদের প্রতি-সংস্কৃতি দলিত সংস্কৃতির এই গর্বকে কায়িক উৎপাদনমুখী শ্রমের প্রতি নিরাসক্ত উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীর সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করে।

ভারতীয় সমাজ যত শিল্প গড়ে তুলেছে, ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের অনেক আগেই, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে, চর্মশিল্প; কিন্তু এ নিয়ে গর্বিত হওয়ার পরিবর্তে, এ সমাজ এ শিল্পের নির্মাতাদের 'অস্পৃশ্য' ঘোষণা করেছে।

উৎপাদনশীল ও উদ্ভাবনকুশল শ্রমকে এ ধরনের তুচ্ছজ্ঞানের নেপথ্যে যে বিষয়টি নিহিত তা হচ্ছে, যাকে লেখক এ বলে অভিহিত করেছেন, "বিজ্ঞান-বিরোধী মনোভাব"। সংক্ষেপে বলা যায়, আত্মিকবাদের উপর ভিত্তি করে দু'বার জন্মের সংস্কৃতি, উৎপাদনশীল কায়িক শ্রম যে দিকে ধাবিত হয় সেই বুদ্ধিসম্পন্ন ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিসদৃশ। তাহলে বোধগম্য যে, দলিতদের প্রতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলো গুরুত্বারোপ করে মানব জীবনের বৈষয়িক ভিত্তির উপর এবং এর জাগতিকতার উপর।

সবশেষে, দলিত প্রতি-সংস্কৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ জানায়, যে মনোভাব নিহিত আছে সংহতি, একত্ব, সহভাগিতা ও অংশগ্রহণের সংস্কৃতির প্রতি কর্তৃত্বশীল সংস্কৃতিতে – ধর্মসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সংহতি, একত্ব, সহভাগিতা ও অংশগ্রহণ এই মূল্যবোধগুলো হচ্ছে, আঁশ বা তন্তু যেগুলো দিয়ে উচ্চতর বর্ণগুলোর কর্তৃত্বশীল সংস্কৃতির ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব ও সামাজিক অনীহার বিপরীতে দলিত সংস্কৃতি বোনা হয়।

দলিত সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের নতুন নতুন প্রতীক

ইতিহাস থেকে জানা যায়, একটি জাতির উপর আধিপত্য চালানোর কর্মকৌশলটি হচ্ছে, সংস্কৃতি নামক অস্ত্রের ব্যবহার। আধিপত্যকারীরা তাদের সংস্কৃতি ও তাদের প্রতীকসমূহ তাদের অধীনদের উপর প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষভাবে চাপিয়ে দেয়; এ সকল সংস্কৃতি ও প্রতীককে সময়ের ধারাবাহিকতায় নিপীড়িত মানুষরা নিজেরাই আত্মস্থ করে নেয়। দলিতদের বিষয়টিও কিন্তু এক্ষেত্রে আলাদা নয়। নিপীড়িত যে-কোন জনগোষ্ঠী, তাদের মুক্তির অংশ হিসেবে, তখনই নতুন নতুন প্রতীকের, বাগধারার ও উপাসনা-পদ্ধতির সন্ধান করে, যখন তারা বুঝতে শেখে যে, এ যাবৎ তারা যেসব প্রতীক ব্যবহার করে এসেছে সেগুলো আসলে তাদের নিপীড়কদেরই ক্ষমতার জোরে চাপিয়ে দেওয়া।

সুতরাং, বিস্ময়ের কিছু নেই যে, অনেক অনেক করে নতুন নতুন প্রতীক ও উপাসনা-পদ্ধতি বেরিয়ে আসছে, যেগুলো দলিতদের মুক্তির মনোভাবের পক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এমন কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আজকে দলিত সমাজের জন্য প্রধানতম চিহ্নটি হচ্ছে, বাবাসাহেব অম্বেদকর। তিনিই হচ্ছেন, দলিত সমাজের অহংকার এবং তাদের মুক্তির সুমহান চিহ্ন। প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চল থেকে শুরু করে শহর ও নগর পর্যন্ত, দলিতরা তাদের উদার অবদানের মাধ্যমে রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং গণচত্বরে গড়ে তুলছে অম্বেদকরের মূর্তি। এটা একটি মুক্তির প্রতীকী ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়টা উচ্চ বর্ণগুলোকে ক্রোধান্বিত করেছে, যারা তাদের উপর নামিয়ে আনে সহিংসতা এবং গোপন তৎপরতা চালায় অম্বেদকরের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার। অতি-সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে ঘটা এরকম একটি ঘটনার দলিতরা সহিংস প্রতিবাদ জানিয়েছে।

দলিত সাহিত্য আন্দোলন

সাহিত্য হচ্ছে, কোন একটি জাতির সংস্কৃতির ও তাদের পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দলিত সাহিত্যের উপর একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ তুলনায় সাম্প্রতিক সময়কালের হলেও, ভগবান বুদ্ধের সময়কাল থেকে কিন্তু এর অস্তিত্ব। 'চোখামেলা', 'মহাত্মা ফুলে' ও আরও অনেকের রচনাকর্মগুলোকে দলিত সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাবা যেতে পারে। তবে, ১৯৭০ এর দশক থেকে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল আর তখন থেকেই রচনাকর্মের একটি অতিশয় সমৃদ্ধ অংশ প্রকাশিত হয়েছে। দলিত সাহিত্য দলিত জনগণের সকরুণ অনুভূতি ও অন্তর্জগত, তাদের দুঃখ-কষ্ট, তাদের দুশ্চিন্তা, তাদের আত্মবিশ্বাস, আর সর্বোপরি সমাজের বিদ্যমান কাঠামোর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের প্রকাশক। দলিত সাহিত্য আন্দোলনকে এমন কিছু হিসেবে ভাবা যেতে পারে যার আগমনের হেতু হচ্ছে, পূর্ববর্তী দশকগুলোর দলিত প্যান্থারদের ব্যর্থতা যে শূণ্যতা রেখে গিয়েছিল, তা পূরণ করা।

মহারাষ্ট্র হচ্ছে, দলিত সাহিত্যের সূতিকাগার, যে সাহিত্য এর আবির্ভাবের পর থেকে সারা দেশে দলিতদের জন্য ক্ষমতায়নের এক বিরাট শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। আসলে, দলিত প্যান্থার অনেকে নিজেরাই ছিলেন লেখক। এ আন্দোলন কর্ণাটক, তামিলনাড়ুসহ আরও অনেক রাজ্যেও উৎকর্ষ সাধন করেছিল। বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে, দলিত সাহিত্য প্রকাশনাগুলো বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত উদ্দীপনাদায়ক, কেননা এগুলো প্রতিষ্ঠিত সনাতনী সাহিত্য ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এর আগে (অধ্যায় ২) আমরা যেমনটি জেনেছি, ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এক দলিত মন্ত্রী সনাতনী কানাড়া সাহিত্যকে গো-খাদ্য বলে অভিহিত করলে, এটা বিতর্কের ঝড় তোলে, অপরাধ হিসেবে উস্কে দেয়, যার একদিকে একটি কারণ হল, একটি গভীর শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্য ঐতিহ্যকে নিয়ে কটূক্তি করার অপরদিকে আর একটি কারণ হল, দলিত সাহিত্যের সাহিত্য প্রকাশনার একটি প্রগতিবাদী পথ খুলে দেওয়া।

দলিত কাব্য এবং অন্যান্য ধরনের রচনাকর্মের উদ্দীপনাদায়ক বৈশিষ্ট্য আত্ম-সমালোচনার সঙ্গে খাপ খায়, যা হচ্ছে এই নতুন রচনাবলী বিন্যাসের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। দলিত রচয়িতাগণ দলিত সমাজের মধ্যে জটিলতাগুলোর, বিপ্লব করার চেয়ে অনুকরণের ও ক্যারিয়ারের উন্নতিবিধানের প্রলোভনের সমালোচনায় কুণ্ঠিত নন। এই অর্থে দলিত সাহিত্য এর স্বাধীনতার মনোভাব এবং এর বিধ্বংসী বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

দলিত সাহিত্যে দলিত নারীদের অবদানেরও উপর আলোকপাত করা দরকার। তাদের রচনাকর্মে, সমাজের দুঃখ-দুর্দশা একটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের রূপ পরিগ্রহণ করে। বাস্তবিকপক্ষে, দলিত নারীদের উপর পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যেমনটি জানব, দলিত নারীর আত্মজীবনী ও বিবৃতিসমূহের একটি নিয়মিত ধারাপ্রবাহ লক্ষ্য করা

যায়। তামিলনাড়ু রাজ্যে, একজন দলিত নারী হিসেবে তার নিজের জীবন সম্পর্কে ভামার কাহিনী আজকের একটি গুরুত্বপূর্ণ তামিল সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য হয়েছে। বেবী কাম্বলে ও শান্তাবাই কাম্বলের আত্মজীবনী যদি শিক্ষিত দলিত নারীর গল্পের নির্দশন হয়, তাহলে ভিরাম্মার কাহিনীগুলো হচ্ছে, একটি সাধারণ অশিক্ষিত গ্রামীণ দলিত মেয়ের প্রতীক, যিনি আমাদের সুযোগ দিচ্ছেন তার জীবনের প্রতিদিনকার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি এবং সংগ্রাম ও দুঃখকষ্ট এক পলক দেখে নিতে।

বিভিন্ন সাহিত্যকর্মগুলো পাঠ করলে–কাহিনী, আত্মজীবনী, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ইত্যাদি–আমরা কিছু পুনঃআবর্তিত মূলভাব ও ভাবনা লক্ষ্য করব যেগুলো এই দলিত সাহিত্য সংগ্রহ প্রতিধ্বনিত করে। উদাহরণস্বরূপ এগুলোতে দলিতদের দুঃখ-কষ্ট এবং তাদের লাঞ্ছনা-অবমাননা ভোগ বর্ণিত হয়েছে। যারা আক্রান্তের শিকার তাদের দ্বারাই বর্ণিত হওয়ায়, এ সকল রচনাকর্ম মন্ত্রমুগ্ধকর। এ সাহিত্য আক্রান্তদের ভাবনা ও আবেগ এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ তুলে ধরে। ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে, দলিত সাহিত্য যেমন আক্রান্তদেরকে সংগ্রামের সময় উৎসাহ, অসহনীয় দুঃখকষ্টের সময় আশা যোগায়, তেমনি এটা যখন তারা নিজেদের শক্তি বা সামর্থ নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করে অথবা যখন তারা লজ্জাবোধ ও হীনমন্যতায় ভোগে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ যোগায়।

সুতরাং, সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে যে, আমাদের সমাজে প্রান্তিক শ্রেণীগুলোর আত্মসম্মান ও আত্মর্যাদার পুনরুদ্ধারে পরিচয় গঠন ও এর ঘোষণার সঙ্গে দলিত সাহিত্য গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই স্বতঃসিদ্ধতাগুলোকে ঘিরে সাহিত্যকর্মগুলোর অধিকাংশ কল্পনা গড়ে উঠেছে। সাহিত্যকর্মগুলোর এজেণ্ডা হচ্ছে, তেমনসব মূল্যবোধের উপর সমাজকে পুনরায় গড়ে তোলার এজেণ্ডা যেগুলো সম্মান ও মর্যাদা, ন্যায় ও সমতার বিস্তার ঘটায়।

বিকাশমান দলিত সাহিত্যের অন্তর্নিহিত অর্থ সাহিত্য জগতকেও ছাড়িয়ে যায়। দলিত সাহিত্যকে একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে দলিত সমাজকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতকারী কিছু মৌলিক মূল্যবোধ বাস্তবতা লাভ করে। অনেক গবেষণা থেকে যেমনটি প্রকাশ পেয়েছে, দলিতদের মধ্যে কাজ করে একটি বলিষ্ঠ সম-অধিকার বোধ, যা সাধারণত সহভাগিতার মনোভাবে প্রকাশ পায়। দলিতদের মাঝে সক্রিয় সংহতি বোধ তাদের উদ্বুদ্ধ করে গণতান্ত্রিক চর্চা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপ করতে। নতুন দলিত সাহিত্য আন্দোলনের সুবাদে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুশীলিত এ সকল প্রচলিত মূল্যবোধগুলো প্রকাশের একটি মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে।

দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত দলিত সাহিত্যের বিশাল সংগ্রহের রয়েছে এগুলোকে অনুপ্রাণিতকারী বহুবিধ ভাবনা, ব্যাখ্যা এবং দর্শন। তবে এগুলোকে মূলত দু'টি লক্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগ করা যেতে পারে। একটি দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বারোপ করে সাংস্কৃতিক দিকের উপর যা বর্ণ প্রথা, হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য, মানুর বিধান এবং এগুলোরই সৃষ্ট দলিত নিপীড়ন ও দুঃখ-কষ্টের উপর আলোকপাত করে। ব্রক্ষণ্য ও অন্যান্য উচ্চ-বর্ণীয় রীতিনীতির শ্লেষোক্তি ও হাস্যকৌতুকছলে তীব্র সমালোচনা করা হয়। অপর দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করে অর্থনীতির উপর এবং দলিতদের ভোগ করা শোষণ-নিপীড়নের উপর। এ দু'টি দিকের প্রতি আরও গভীর দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

বর্ণ-প্রথা, যা অঙ্কুরেই দলিতদের সৃজনশীলতা বিনষ্ট করে ফেলে, তার চরম ধ্বংসাত্মক প্রকৃতি দলিত সাহিত্য প্রকাশ করে, দলিতরা যারা কি-না তাদের শ্রম দিয়ে উচ্চ বর্ণীয় শ্রেণীবিন্যাসের যে পিরামিড তার ভার বহন করে।

দলিতরা যেসব বঞ্চনা-প্রবঞ্চনা ভোগ করছে সেগুলোর আলোকপাত ছাড়াও, অর্থনৈতিক অবস্থার উপর আলোকপাতকারী অপর দৃষ্টিভঙ্গি পরাশ্রয়ী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বর্ণ/শ্রেণীগুলো, যেগুলো দলিতদের শ্রম শোষণ করে এবং ভূমি ও জীবিকার অন্যান্য মাধ্যম থেকে তাদের বঞ্চিত করে, সেগুলোও তুলে ধরে। এটা ব্যক্ত করে, তাদের কঠিন পরিশ্রমের কথা যার উপর নির্ভর করছে তাদের স্বীয় অস্তিত্ব।

দলিত কাব্য ও সাহিত্য বাবাসাহেব অম্বেদকরের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে, দলিতদের জন্য নতুন সূর্য হিসেবে যিনি প্রশংসিত হন সমাজকে তার নেতৃত্বদানের জন্য এবং তাদের জ্ঞান বা সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য।

দলিত লোককাহিনী

দলিত সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ দলিত জনগণের লোককাহিনীর পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি চলেছে। নিজেদের সম্পর্কে কতিপয় বিশ্বাসের সমষ্টি এবং তাদের কিছু শৈল্পিক ও মঞ্চাভিনয়ধর্মী প্রচলিত রীতি, এগুলো নিয়েই এই লোককাহিনী। দলিতদের লোকবিশ্বাসকে Eleanor Zelliot সংক্ষেপে তিনটি মৌলিক বিশ্বাসে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত, দলিতরা বিশ্বাস করে না যে, অন্য কারোর সৃষ্ট একটি সংস্কৃতির তারা শুধুই গ্রাহক নয়, বরং তারা এও বিশ্বাস করে যে, তারা নিজেরাই হচ্ছে একটি মহান সংস্কৃতির চরিত্র ও স্রষ্টা। দ্বিতীয়ত, এটা হল তাদের বিশ্বাস যে, তারাই হচ্ছে, এ দেশের আদিম বা প্রথম বাসিন্দা, আর এই কারণে তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম, কোন শক্তির অধীন নয়। তৃতীয়ত, দলিতদের নিজেদের এমন একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে জানে যারা জন্ম দিয়েছে অনেক বীর যোদ্ধা ও নায়কদের, একটি ঐতিহ্য যে কারণে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে মাহারদের বিরাট একটি অংশকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

দলিত থিয়েটারে অভিন্নধর্মী প্রচলিত রীতিগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা এগুলোর মধ্য দিয়ে উচ্চ বর্ণীয় ভাবধারার সমালোচনা করা এবং নিপীড়ন-শোষণের কৌশল সম্পর্কে দলিতদের সচেতন করে তোলা হয়। দলিত থিয়েটার তাদের আবেগ ও মনোকষ্ট তুলে ধরে, এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বর্ণগুলো কর্তৃক শোষণ ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করে। বিভিন্ন ধরনের দলিত লোকাহিনীর রয়েছে গভীর রাজনৈতিক প্রভাব, আর এগুলো বিবেকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। দলিত থিয়েটার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা, বিষয়বস্তু হিসেবে অন্যান্য থিয়েটারগুলোর আছে পৌরাণিক গল্প ও কাল্পনিক কাহিনী, আর এ সকল থিয়েটারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনোরঞ্জন, আত্ম-প্রশংসা এবং সমাজ-ব্যবস্থা তুলে ধরা; যখন অপরদিকে, দলিত থিয়েটার বাস্তব জীবনের বাস্তবতাগুলো গভীর রুচিবোধ সহকারে উপস্থাপন করে, আর এর লক্ষ্য হল, মুক্তি এবং একটি শ্রেণীবিহীন সমাজ সৃষ্টি।

উপসংহার

দলিতদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের অভাব থাকলেও, নিজেদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। আর এটা সংস্কৃতির অস্ত্র। এটা এমনই এক অস্ত্র যা দলিতদের মধ্যে আবদ্ধ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দলিতরা রাজনীতিতে তাদের ন্যায়সম্মত স্থান এবং দেশের সম্পদে তাদের অংশ দাবি করার জন্য ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠবে। এটা দাবি করে কর্তৃত্বময় সংস্কৃতি ও এর ইতিহাস রচনার সমালোচনা। দলিতদের প্রতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে কর্তৃত্বময় সংস্কৃতির বিনাশ ও প্রকাশ এবং উৎপাদনশীল শ্রম থেকে থেকে এর বিচ্ছিন্নতা। প্রতি-সংস্কৃতিতে শ্রেণীবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে রচিত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সংহতি ও অংশগ্রহণের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের তুলনা করা।

দলিতদের বিগত দিনের ও আজকের সাংস্কৃতিক সম্পদ তাদের সংগ্রামে অবদান রাখতে শুরু করেছে। বিশেষ করে আমরা দেখেছি, কিভাবে দলিত সাহিত্য ও লোককাহিনী সমাজকে বিবেকী করতে এবং দেশের উচ্চ বর্ণ ও অভিজাত শ্রেণীগুলো, যেগুলো তাদেরকে দমনের সদা নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে, সেগুলোর চ্যালেঞ্জকে রুখে দাঁড়াতে একে সাহসী করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।